(1)

অন্নদামঙ্গল
ভারতচন্দ্র

কবি পরিচয়: বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের (অষ্টাদশ শতাব্দী) শ্রেষ্ঠ কবি এবং মঙ্গলকাব্যধারার সর্বশেষ শক্তিমান কবি। হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে জন্ম হলেও, পরবর্তীকালে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সভাকবির স্থান পান। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের জন্যই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র খুশি হয়ে কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি এবং মুলাজোড় গ্রাম উপহার দেন। কবি বহুভাষাবিদ — সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্থানী ভাষার মিশ্রণে নতুন এক বাগভঙ্গি নির্মাণ করেছিলেন। যা 'যাবনী-মিশাল' ভাষা নামে পরিচিত। তাঁর কাব্যের অনেক পদ আজও বাংলা ভাষায় প্রবচন তুল্য। রবীন্দ্রনাথ কবির কাব্যকে যথার্থভাবেই 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৭৬০ খ্রী: কবি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সাথেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সমাপ্তি বলে ধরা হয়।

(২)

কাব্য পরিচয়: ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২ খ্রীঃ) কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা—

ক) শিবায়ন – অন্নদামঙ্গল, খ) বিদ্যাসুন্দর - কালিকামঙ্গল,
গ) মানসিংহ – অন্নপূর্ণামঙ্গল।

প্রথম খণ্ডের মূল ঘটনা পৌরাণিক। এতে সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীর বিবাহ, শিবের সংসার ও কাশীতে দেবীর অন্নপূর্ণামূর্তি ধারণের বর্ণনা আছে। এর সঙ্গে আছে হরিহোড়কে ছেড়ে দেবীর ভবানন্দ মজুমদারের বাড়িতে গমন এবং গমনপথে ঈশ্বরী পাটনী প্রসঙ্গ। এখানে বলে রাখা ভালো যে ভবানন্দ মজুমদার হলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ।

দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনী বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়-লীলা। দেবী কালিকার কৃপায় কীভাবে সুন্দর বিদ্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং মশান থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন — তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এখানে।

তৃতীয় খণ্ডের কাহিনী অনেকাংশে ঐতিহাসিক। মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দিকরণ এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ভবানন্দের 'রাজা-ই-ফরমান' লাভের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

***) দেবী অন্নপূর্ণা চরিত্র :** মধ্যযুগের অন্তিমলগ্নে রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। এই কাব্যের প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র হল দেবী অন্নপূর্ণা। অন্নদারূপে তিনি কাশীবাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। চৈত্রমাসের শুক্ল অষ্টমী তিথিতে দেবীর পূজা। কাব্যের প্রথমে দেবীকে আমরা পাই সতী হিসাবে, — ~~[illegible]~~ দক্ষ রাজা ও প্রসূতির কন্যারূপে। পরে তিনি হিমালয় রাজের কন্যা উমাতে পরিণত হয়েছেন। দেবী মহিমার সার্বভৌমত্বে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সব দেব-দেবীকে ছাড়িয়ে গেছেন। পরমা প্রকৃতি অন্নপূর্ণা বিশ্বের জননী হিসেবে সবার উপরে সমান করুণা বর্ষণ করেছেন—

"জগজ্জননী মাতা সবার সমান।
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান।
আকাশ পবন জল অনল অবনী।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি॥
হরিহর প্রভৃতির শক্তিভিন্ন আছে।
শক্তিভিন্ন সকলেই অন্নদার কাছে॥"

অন্নপূর্ণার দেবীরূপ প্রসঙ্গে সতীর দক্ষালয় গমন, দশমহাবিদ্যা রূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অন্নপূর্ণা ~~দেবীরূপের কথা বলা হয়েছে~~ মহামায়া এবং সকল সংসারই তার মায়া। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় — সবকিছুতেই তিনি। ঘটনাক্রমে পিতৃগৃহে দক্ষযজ্ঞে ও অনিমন্ত্রিত সতীকে অনেক গালমন্দ শুনতে হয়েছে স্বামী শিব সম্পর্কে। তা শুনে

5

ADDITIONAL SHEET

Signature of the invigilator

Roll No. ....

— এরপর তো কোন স্ত্রীর পক্ষেই এরূপ অপবাদ সহ্য করা মুশকিল। তাই দেবী উমাও স্বামীর প্রতি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ —

কুচনিলি বিড়য়া ছুমা বুড়াটির কোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
— — — — — —
বড় পুত্র গজানন চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ছোট পুত্র কার্তিক ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে খাতে আমি এই খেদে যেমন অলক্ষণ॥

— অন্নপূর্ণা শুধুমাত্র শিবের গৃহিণী নন, সন্তানের জননীও। অভাবের সংসারে সন্তানকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে রাখা নিয়েও তাকে ভাবিয়েছে। আসলে অষ্টাদশ শতকীর বিপর্যস্ত সমাজের প্রতিফলন ঘটেছে অন্নদা চরিত্রে। জরতীবেশে ব্যাসদেবকে ছলনার মধ্যেও আমরা দেবীর সন্তান কাতরতার রূপটি লক্ষ্য করি। অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী অংশটি এক চমৎকার সৃষ্টি। সহজ-সরল পাটনীর কাছে দেবী ধরা দিয়েছেন সাধারণ গৃহবধূ হিসেবে। এবং তার প্রতি কৃপাবর্ষণ করেছেন। সেক্ষেত্রে পাটনী দেবীর কাছে বর প্রার্থনা করেছেন—

অপমানিতা দেবী সতী আত্মহত্যা করেছেন। এরপর দেবী সতী হিমালয়রাজের গৃহে উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যের মধ্যে উমার দেবীরূপ অপেক্ষা মানবিক রূপটাই বেশি করে প্রকাশিত হয়েছে।

ভোলানাথ শিবের স্ত্রী উমা হিসাবে সংসারের যাবতীয় দুঃখকষ্টকে দেবী মানিয়ে নিয়েছেন। খাদ্যাভাব, ক্ষুধা দৈন্য শিবের সাথে দেবীর দাম্পত্য কলহ লেগেই আছে। শিব তাদের দৈন্যতা প্রসঙ্গে দেবীকে অভিযুক্ত করলে, দেবীও পাল্টাযুক্তির দ্বারা তা খণ্ডন করেছেন। পুরুষের (শিবের?) ভোগবিলাস ও বহুগামিতার প্রতি দেবীর কটাক্ষ —

'অর্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনি বাড়ি তবে কেমনে যাইবা॥'

— এই শিব-উমার দাম্পত্য কলহের মধ্যে মধ্যযুগে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থানটা স্পষ্ট হয়েছে। নারী এখানে চূড়ান্ত বৈষম্যের স্বীকার। দরিদ্র গৃহিণী হিসেবে দেবীর কলহপূর্ণ রূপটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। শিব যখন অভিযোগ তোলেন—

"বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্বদা কন্দল বাড়ে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে নীরস হয় যায়॥"

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে"।

— অষ্টাদশ শতাব্দী নানা কারণে অস্থিরতা বর্গি-হাঙ্গামা, উপযুক্ত কেন্দ্রীয় শাসনের অভাব, জলদস্যুদের আক্রমণ, বন্যা ইত্যাদি। এই আতঙ্কিত অবস্থায় পাটুনী ঠিক এই চেয়েছে। কেননা সোনাদানা চাইলে এ দেশের আতঙ্কিত অবস্থায় রক্ষা করবে কীভাবে।

'অন্নই' অন্নদামঙ্গল কাব্যের মূল মন্ত্র। আর এই কাব্যের মঙ্গলকারিণী দেবীর নামও অন্নদা, অন্নপূর্ণা। যিনি নিজে নিরন্ন থেকেও জগৎবাসীকে অন্ন জুগিয়ে চলেছেন। পরিচিত হয়েছেন অন্নদাত্রী জগজ্জননীরূপে। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেব-দেবীরা যেখানে কোপনস্বভাবা, ধনদেবী কিংবা ঐশ্বর্যশালীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন; সেখানে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দেবী অলোকলোকা মানবিকস্থলে নতুন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করেছেন, এখানেই দেবী অন্নদার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য।

সমাজচিত্র : সাহিত্য হলো সমাজের দর্পন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যদর্পনে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়িত বাংলার সমাজ-ইতিহাসের নানা ছবি ফুটে উঠেছে। আমরা নিম্নে, কাব্যে প্রতিফলিত সমাজের ছবিগুলি সূত্রাকারে উপস্থাপন করলাম ——

১। বর্গী হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত বাংলা :

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার বুকে নানা রাষ্ট্রনৈতিক সংকট তৈরী হয়েছিল। এতদিন শক্তিশালী মুঘল শাসনে বাংলা তথা ভারতবর্ষ সুদৃঢ় শাসনপাশে আবদ্ধ ছিল। এখন সেই মোঘলশক্তির প্রতাপ ও পরাক্রম আর নেই। বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটেছে। বাংলাও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। এইসময়ে বাংলায় বিভিন্ন আমোরা নবাবের ভাগ্যের উত্থান-পতন ঘটে। শাসনব্যবস্থা তলানিতে এসে ঠেকে। দেশে ন্যায়বিচার বলতে আর কিছু নেই। এর উপর বাংলার উপর বর্গীদস্যুদের আক্রমন। বর্গীদস্যু ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে বাংলায় লুঠ-পাট, খুন-হত্যা-ধর্ষণ, রাহাজানি, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনাতে বাংলার পর্যুদস্ত প্রাপ্ত হয়েছিল। কবি তার কাব্যে ইতিহাসের এই ছবির বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ——

"লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হইল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রামগ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥"

২। নগরজীবনের চিত্র: অন্নদামঙ্গল রাজসভার কাব্য। সুতরাং প্রধানে রাজসভা, নগরজীবনের ছবি স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে। নাগরিক জীবনের নানা ভোগ-বিলাসের, আমোদ-প্রমোদের বর্ণনা দিয়ে গেছেন কবি কাব্যে। যেমন —

৩। বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথা: মধ্যযুগের বাংলার হিন্দুসমাজে পুরুষের বহুবিবাহ এবং কৌলিন্যপ্রথা দারুণভাবে প্রচলিত ছিল। অন্নদামঙ্গল কাব্যেও এই চিত্র উঠে এসেছে। হর-গৌরীর বিবাহ কৌলিন্যপ্রথার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাছাড়া কাব্যের, হরিহোড় চরিত্রটিও বহুবিবাহ করেছিল তার প্রমাণ আছে। —

৪) ধর্মাচরণে দ্বন্দ্ব: তখন বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ, জাতপাত, অস্পৃশ্যতা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। শৈব ও শাক্তর মধ্যেও দ্বন্দ্ব প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। আসলে সমাজে হিন্দুর কাছেই বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তৈরী হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কলহ লেগে যেত মাঝে-মধ্যে। কাব্যের মধ্যে ব্যাসদেব চরিত্রে হরি বড় না হর বড় — এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বাঙালী হিন্দুর

BHATTER COLLEGE DANTAN

ADDITIONAL SHEET

Signature of the invigilator

Roll No. ....

ধর্মীয় বিভেদের ছবিটি ধরা পড়ছে। অনৈক্য কবি বিভেদে? আমি অভেদের বানী শুনিয়েছেন—

'অভেদে যেজন ভজে সেই ভক্তবীর।'

c) ~~দারিদ্র্য ও অন্ন~~ হতদরিদ্র বঙ্গবাসী :

অষ্টাদশ শতাব্দী নানা কারণে অস্থিরতা। শাসকের শোষণ-অত্যাচার যেমন ছিল, তার উপর ছিল বর্গীদস্যুদের আক্রমণ। এই আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়নি বাংলার মানুষ। ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। দারিদ্র্য-অনাহার বাঙালীর নিত্য জীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠে। ~~ঈশ্বরের উক্তিতে দারি~~ ক্ষুধায় কাতর ঈশ্বরের উক্তিতেই তা স্পষ্ট—

"কান্তার করেন শুন শুনহ কান্তারী।
ক্ষুধায় কাঁদায়ে অন্ন বলহ কী করি।
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া জোগাই
সমারি করে একদিন পেট ভরে খাই।।"

— দারিদ্র্যের আরো ভয়ঙ্কর বর্ণনা আছে। এপ্রসঙ্গে দামিনী চরিত্রটির বর্ণনা উল্লেখযোগ্য—

"লতা বান্ধা পাত্রা পাতে — কড়ি আচ্ছাদন
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে ঝামা আচ্ছন্ন।
অস্থিহীনা কলেবর অস্থি চর্ম সার
ভোঁয়া লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥"

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি হলেও যুগসন্ধিক্ষণের কবি, সমাজ সচেতন শিল্পী। সমকালীন দেশ-কাল-সমাজকে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেমন বুঝেছিলেন তেমনি অসাধারণ শিল্প-কৌশলে সমাজ-ইতিহাসকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপসংহারে ইতি টানবো কবির উক্তির মধ্য দিয়েই —

"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
ভিক্তুর বাল্মীকি লোক থেকে গেল দায়॥"